আদিসভ্যতার মহানায়ক জমশিদ

অনুবাদ ঃ সুধীর করণ

কিংবদন্তী এবং পুরাকাহিনীর কুয়াশা ভেদ করতে পারলে প্রাচীন ইতিহাসের রেখাচিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। প্রাচীন ইরানীয় আর্যদের প্রাচীনতম মহানায়ক জমশিদ মূলত ইতিহাসের স্পষ্ট আলোকে বিবৃত কোন চরিত্র নয়। তবু প্রাচীন আর্যজাতির দূরতম পরিসরে জমশিদ নামক এক মহানায়কের সাক্ষাৎ মেলে, — যাকে উহ্য রেখে প্রাচীন আর্যজাতির পরিমণ্ডলে পৌঁছানো যায় না। জরথুষ্ট্রিয় ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় জমশিদের কীর্তিকাহিনী বর্ণিত হয়েছে; শুধু তাই নয়—খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত কবি ফেরদৌসীর শাহনামান গ্রন্থেও জমশিদের উত্থান - পতনের বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান। ফেরদৌসী এক বিস্ময়কর যোগসূত্রে আবদ্ধ করেছেন আর্যজাতির প্রাচীনতম দুটি গ্রন্থ বেদ ও আবেস্তাকে।

জরথুস্ত্রের কয়েক হাজার বছর আগে জমশিদের আবির্ভাব। আবেস্তা মহাগ্রন্থে জমশিদ যিম নামেও কথিত। কখনও বা তাঁকে ইয়মশ্বেত নামেও অভিহিত করা হয়েছে আবার কোথাও কোথাও তাঁকে বলা হয়েছে যিম বা জমশিদ বা জমশেদ। ইরানীয় আর্যজাতির পরিত্রাতা সম্রাট দরিয়ুসের মতো সম্রাট জমশিদ প্রমানযোগ্য ব্যক্তি না হলেও লোকশ্রুতির মধ্যে জমশিদই প্রথম সমাজ সংগঠনের মহানায়ক। মহাকবি ফেরদৌসী সেই লোকশ্রুতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তাঁর ইতিহাস শাহনামা রচনা করেছিলেন। ফেরদৌসী শাহনামাতে শুধু ইসলাম ধর্মীয় রাজন্যবর্গের কাহিনীকে উপজীব্য না করে তার মধ্যে প্রাচীন ইরানীয় ধর্মে আস্থাশীল রাজাদের কাহিনীও গ্রহণ করেছেন। বস্তুত—প্রাচীন ইরাণীয় সভ্যতার লোকশ্রুতিমূলক পুরাকাহিনীকে লিপিবদ্ধ না করলে ইরাণীয় আর্যজাতির আদি পর্যায়ের সঙ্গে বৈদিক আর্যদের সঙ্গে তাদের আত্মিক যোগসূত্র আবিস্কৃত হতো না।

প্রাচীন ইরানীয় কিংবদন্তীতে বলা হয়েছে যে কোন এক বিস্মৃত অতীতে আর্যজাতির আদি বাসভূমি ছিল। আরিয়েনেম বয়েজো (Aryanem Boyejo) নামে কোন ভূখণ্ড। কিন্তু এই ভূখণ্ডের অবস্থান ঠিক কোথায় ছিল সে বিষয়ে পণ্ডিত সমাজে মতভেদ বর্তমান। কোন কোন পণ্ডিত আধুনিক কালের আজার বাইজানকের আর্যজাতির আদি বাসভূমি রূপে চিহ্নিত করেন। বালগঙ্গাধর তিলক মনে করেন, আর্য জাতির আদি বাসভূমি ছিল উত্তরমেরু অঞ্চলের কাছাকাছি কোন এক হিমাবৃত অঞ্চল। অনেকে আবার প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্যাবর্তকেই এই সম্মানের অধিকারী করেছেন। কিন্তু প্রাচীন ইরাণীয় কিংবদন্তীতে এই কথাই বলা হয় যে— আরিয়ানেম বয়েজো থেকে ক্রমে ক্রমে আর্যজাতির আগমন ঘটে সুগদা নামক স্থানে এবং পার মুরু নামক অঞ্চলে অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষের পর সেখান থেকে পূর্বদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে পড়েন।

কিংবদন্তীতে আরও বলা হয়েছে যে আর্যরা শেষ পর্যন্ত দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যারা পূর্বাঞ্চলে অধিষ্ঠিত হয় তাদের বাসভূমির নাম আরাহ বৈতি, বয়েতুমস্ত এবং বপ্ত হিন্দু (= সপ্ত সিন্ধু), আর যারা পশ্চিম দিকে চলে যায় তাদের বাসভূমির নাম উর্ব, ভেরকানা এবং বরেনা। এর মধ্যে 'আরাহবৈতি' সম্ভবত আর্যাবর্ত শব্দের সাদৃশ্যযুক্ত; হপ্তহিন্তু অবশ্যই সপ্তসিন্ধুর নামান্তর।

এই প্রাচীন আর্যগোষ্ঠীর লোকেরা ছিল প্রকৃতি উপাসক। প্রকৃতি দেবতার নামে তাঁরা হোওম বা উৎসর্গ করতেন— অনাবৃষ্টি ও অন্ধকার থেকে রক্ষালাভের জন্য। অনির্বান - অগ্নিশিখা জ্বেলে রেখে তাঁরা অগ্নিদেবতাকে নিত্যসংগীরূপে অর্চনা করতেন। ইরানীয় আর্যদের প্রধান দেবতার নাম অহুর মজদা-যার অর্থ Lord of great knowledge অহরমজ্‌দাই জগতের সৃষ্টিকর্তা। এঁর বিরোধী ছিল অহ্রিমান (Spirit of evil) অহুরমজ্‌দার সংগ্রাম এরই বিরুদ্ধে।

আবেস্তার যশান্ অংশ থেকে জানা যায় অতীতে চারজন মহান ব্যক্তি সোমলতা রক্ষা করছিলেন, যার ফলে ওরা প্রত্যেকেই এক এক জন মহান সন্তান লাভ করেছিল। এই সব সন্তানদের প্রথম ব্যক্তির নাম। বিভনঘন্ত। এই বিভনঘন্ত্ -এর পুত্রই মহানায়ক জমশিদ বা মিম– যার এক ভগ্নী– দিল শবনামযমী। জমশিদ শব্দের অর্থে উজ্জ্বল যম (yama the bright.)

বস্তুত, ঐতিহাসিক স্বীকৃতিলাভ না করলেও আর্যজাতির কোন এক গোষ্ঠীকে তিনিই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনিই ছিলেন তাদের পথ প্রদর্শক; তিনি আর্য গোষ্ঠীকে অন্যত্র এনে অন্য বাসভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সম্ভবত কোন উত্তরাঞ্চল থেকে– প্রাচীন এক আর্যগোষ্ঠী জমশিদের নেতৃত্বে অন্য বাসভূমিতে এসেছিল। অনেকের মতো– প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্যাবর্ত থেকেই তাঁদের অভিযাত্রা।

কিংবন্তীর এই সম্রাট জমশিদের রাজ্য ছিল জরা মৃত্যুহীন এক রাজ্য। প্রাচীন আর্যগোষ্ঠীর মধ্যে সমাজ সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে তিনিই তাদের চারটি ভাগে ভাগ করেছিলেন– যার সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের চতুর্বর্ণ প্রথার মিল লক্ষ্য করা যায়। এই চার বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বর্ণকে বলা হতো আর্থবন– যাঁরা ছিলেন অগ্নিরক্ষক পুরোহিত এবং পুরুষানুক্রমে শ্রেষ্ঠ বর্ণ। অন্যান্য তিন শ্রেণীর মধ্যে যথাক্রমে ছিল যুদ্ধজীবি ও কৃষিজীবী ও কর্মজীবিশ্রেণী—ভারতীয় আর্যদের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের মতো। তবে জমশিদ শূদ্রবাচক কোন অন্ত্যজ শ্রেণী বিভাজনের মধ্যে ছিল না। পরিবর্তে কর্মজীবি শ্রেণীকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে– সেই প্রাচীনকাল থেকেই ইরাণে এবং ভারতবর্ষে অথবা শব্দটি একই অর্থে প্রচলিত। দুটি দেশেই অগ্নিপূজা এবং পৌরোহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বশিষ্ঠ ঋষির পুত্র অর্থবান বা অর্থবা ঋষির নামে প্রসিদ্ধ। ভারতীয় অথর্ববেদ অথর্ব, অঙ্গিরা এবং ভৃগু এই তিনজন ঋষিরই রচনা বা সংকলন। প্রাচীন পারসিক আথর্বন এবং ফরাসী আতুরবান শব্দের অর্থ -ও অগ্নিপূজারী।

জমশিদ সম্পর্কে যে সব কিংবদন্তীর প্রচল– তার মধ্যে এও ছিল যে তিনি ছিলেন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা তাঁর ছিল এবং তাঁর এমন একটি যাদুপাত্র ছিল, সেই পাত্রটির (জাম-ই জমাশিদ) কাছে প্রার্থনা করলে সব কিছুই পাওয়া যেতো। ওঁর যা শিল্প জানার ইচ্ছে হতো, সব কিছু-ই তিনি জানতেন পারতেন ঐ যাদুপাত্রের কাছে। অংক এবং জ্যোতির্বিদ্যাতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। বসন্তকালে—যেদিনটিতে দিন ও রাত্রি সমান হতো, সেই দিনটিকে তিনি নওরোজ বা নবর্ষের প্রথম দিন বলে ঘোষণা করেন। পার্শিরা এখনও জমশিদি নওরোজ পালন করে, উৎসবের মধ্যে সেই দিনটিকে স্মরনীয় করে রেখেছেন। জমশিদকে স্মরণ করে ইরানে এখনও মুসলমান - অ- মুসলমান নির্বিশেষে বারো দিন ধরে এই উৎসব পালন করে থাকেন। বলা হয়—প্রলয়ংকরী বন্যা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করে, অহুরমর্জদার নির্দেশে তিনি তাঁর যাদু - আংটির সাহয্যে প্রজাকুলকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁরই আজ্ঞাবহ এক জিন তাঁকে পিঠের উপর চড়িয়ে দেশ-বিদেশে নিয়ে যেতো। জমশিদ তাঁর হাতের বালা ছুঁইয়ে প্রজাদের ব্যধিনিরাময়ও করতেন। জমশিদ সম্পর্কে এমন কিংবদন্তীও আছে যে তিনি অহ্রিমানে শরিতকে খর্ব করেছিলেন। তাছাড়া জমশিদই প্রথম গৃহনির্মাণের জন্য ইট তৈরী করতে শেখান! গৃহনির্মানের দক্ষ স্থপতিও তিনিই। তিনিই সর্বপ্রথম জাহাজ তৈরী করেন এবং সেই জলযানে সমুদ্র পাড়ি দেন। সমুদ্রগর্ভ থেকে মুক্তা আহরণের কৌশল, কৃষিকর্ম শেখানো, বাদ্যযন্ত্র সুরতন্ত্রও তাঁরই নির্মাণ। পুষ্পসার, সোনা, রূপো মনিমুক্তার অলংকার নির্মান, আখের রস থেকে চিনি তৈরি করার কৌশল, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সব কিছুই জমশিদের কৃতিত্ব। বস্তুত মানবসভ্যতার প্রথম প্রবর্তক তিনি। তিনিই স্বর্ণযুগের প্রবর্তক এবং তিনিই মনুষ্যজাতির ত্রাণকর্তা।

।। দুই।।

এই জমশিদের সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের যমের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। জমশিদের পরবর্তী জীবন অবশ্যই খুব দুঃখের। রামায়নের রাবণ চরিত্রের সঙ্গেও তাঁর চরিত্রগত সাদৃশ্য বর্তমান। রাবণের মতো জমশিদ ও স্বর্ণপ্রসাদের অধীশ্বর; দুজনের রাজ্যই সোনার রাজ্য। রাবণ যেমন অতিদর্পে হত হয়েছিল, জমশিদও তেমনি নিজের ক্ষমতার দর্পে উন্মত্তের মতো আচরণ করে দেবত্বলাভ করতে চেয়েছিলেন বলে তাঁর রাজ্যে প্রজা বিক্ষোভও ঘটে আর মরুভূমিদেশের এক রাজপুত্র জোহাক—ইরাণ আক্রমণ করে জমশিদকে পরাজিত করে রাজ্য অধিকার করে। জমশিদ দেশত্যাগ করে একশো বছর আত্মগোপন করে থাকেন। পণ্ডিত বাসসারার মতে জমশিদ ঐ সময় ভারতবর্ষেই আত্মগোপন করেছিলেন এবং সেখানেও তিনি ভারতীয় সভ্যতার সূত্রপাত করেন, আর্যদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে দু জনই একই ব্যক্তি বলেও অনেকের অভিমত।

জমশিদ অবশেষে ধরা পড়েন এবং তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বস্তুত, জমশিদের উত্থান পতনের কাহিনী কিংবদন্তী অনুসারী। ফেরদৌসী প্রাচীন ইরাণের রাজবংশধারার মধ্যে জমশিদকে স্থান দিয়ে প্রায় ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছেন। শাহনামার কাহিনীতে বলা হয়েছে— ''সোনার মুকুট মাথায় নিয়ে জমশিদ বসলেন সোনার সিংহাসনে। বললেন— আমি রাজা আমিই সৃষ্টিকর্তা। অশুভ শক্তির অন্ধকার থেকে মানুষের আত্মাকে আমি নিয়ে যাবো আলোকের পথে, তমসা থেকে জ্যোতিতে।''

ফেরদৌসী, জমশিদের কীতিকাহিনী সম্পর্কে আরও বলেছেন জমশেদই প্রথম বীর যোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র নির্মাণ করেন; লোহার আবিষ্কার করে তিনিই প্রথম লোহার বর্ম ও শিরস্ত্রান নির্মাণ করেন; জীবনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাঁর এই আবিষ্কার ও নির্মাণ কার্য। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তিনি ঐশ্বর্যশালী সম্রাট আর বীর্যবান যোদ্ধা। এর মধ্যেই তিনি তাঁর প্রজাদের শিক্ষা দেন সুতো আর রেশমী বস্ত্র বয়নের কৃৎ কৌশল। তারপর ইরাণীয় আর্যসমাজকে, কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণে বিভক্ত করেন, —ভারতীয় বর্ণাশ্রম প্রথার সঙ্গে যার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম বর্ণের কাজ হয়, পর্বতে অধিষ্ঠিত দেবতাদের পূজা করা; এই প্রথম বর্ণের মানুষই বংশানুক্রমিক পবিত্র মানুষ। দ্বিতীয় শ্রেমীতে যোদ্ধা বা সৈনিক জাতির অধিষ্ঠান— যারা রাজসিংহাসন রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত প্রহরী, দেহরক্ষী এবং দেশরক্ষী বীর। তৃতীয় শেণীর মানুষ—কৃষিজীবী-যারা সবাই স্বাধীনভাবে শস্য উৎপাদনের অধিকারী; এরাই দেশের মানুষের জন্য অন্নসংস্থান করে। তারাই সাধারণ ভাবে দরিদ্র—অন্ন গ্রহণের সময় কেউ তাদের মনেও রাখে না। তবু তারা কারুর দাস নয়। নিজেরাই জমির মালিক। কোন বিদ্রূপকেই তারা গ্রাহ্য করে না, নিবিষ্টচিত্তে কৃষিকর্মে রত থাকাই তাদের কাজ। ফেরদৌসী বলেছেন—

মহৎ যাঁহারা তাঁহারা বলেন, শোন
স্বাধীন স্ববশ যারা
অলস হলেই তারা।
অবশেষে হয় দাস—।

চতুর্থ শ্রেমীতে উপস্থাপিত হলো অন্য ধরনের কর্মীদল, কামার, কুমোর ছুতোর–যারা হাতের কাজে দক্ষ। এরা কিন্তু ভারতীয় চতুর্বর্ণ প্রথার শুদ্র জাতির মতো নয়, এরাও বৈশ্য জাতির মতোই, ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য কোন বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভাবন করাননি জমশেদ। আবেস্তায় এই চার বর্ণের নাম— অথর্বণ (পুরোহিত), রথেষ্ট্রার (যোদ্ধা) আর ব্যাসস্ত্রাস এবং দাতাক্ষ (= সুদক্ষ বা সাতক্ষ)

এরপরেই জমশেদের অহংকার হয়ে উঠলো গগনস্পর্শী। তিনি তখন দেবদের নিযুক্ত করলেন দাসত্বে। তারা হলো শ্রমিক। মাটিতে জল ঢেলে কাদা থেকে কিভাবে ইট তৈরী করতে হয়, তিনিই শেখালেন তাদের। জমশেদের নির্দেশে দেবতারা পাথর আর চুন মিশিয়ে গৃহভিত্তি নির্মাণের কাজ শিখে নিল। তাঁরই নির্দেশে নির্মিত হলো গগনচুম্বী প্রাসাদ—বিশাল কক্ষ—স্নানাগার—মঠ আর মন্দির। পাহাড়ের গর্ভ থেকে তিনি আবিস্কার করেন উজ্জ্বল মণি - মাণিক্য - সোনা - রূপা চূণি আর পান্না। ফুলের নির্যাস থেকে তৈরী করতে শেখালেন পুষ্পসার বা আতর; তৈরী করেন কর্পূর, কস্তুরী, আঠা ও গোলাপজল। চিকিৎসার জন্য ঔষধ আবিষ্কারও তাঁরই। জাহাজ নির্মাণ করে তিনিই প্রথম সমুদ্রযাত্রী।

বস্তুত, আদিসভ্যতার প্রবর্তকই এই জমশেদ। তাঁর কৃতিত্বে সারা পৃথিবী নতজানু হলো তাঁর কাজে। জমশেদ নিজেকে সৃষ্টিকর্তা ভেবে নিলেন। বললেন— আমিই সম্রাট, আমিই সমস্ত সৃষ্টিকর্মের নিয়ামক। মাথায় সোনার মুকুট পরে সোনার সিংহাসনে বসে তিনি ঘোষণা করলেন—তাঁর নামেই পালিত হবে নববর্ষের প্রথম দিন। শুরু হলো নববর্ষের উৎসব। জ্ঞানে - গরিমায় শৌর্যে বীর্যে অনন্য সাধারণ এই মহানায়ককে ফেরদৌসী নিজেও মানব সভ্যতার প্রবর্তক বলে চিহ্নিত করেছেন। ফেরদৌসী একটি বিষয়ে কিন্তু নীরব। জমশেদই যে সুরাপানের ও প্রর্বতক এ কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেননি, যদিও এক প্রাচীন কিংবদন্তীতে তার সুরা আবিষ্কারের কথা ও বলা হয়েছে।

শাহনামা থেকেই জানা যায় যে—এরপর আত্মশ্লাঘা এসে গ্রাস করলো জমশেদকে। অতিদর্পে তিনি অহুর মজদাকেও ভুলে গেলেন। ফেরদৌসী অবশ্য অহুরমজদা শব্দটি ব্যবহার করেনি— বলেছেন ভগবান। জমশেদ ভাবলেন তিনিই বিশ্বের নিয়ামক— আর সবাই তাঁরই দাস—। সিংহাসনের বসে বিশ্বের সমস্ত রাজাকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর রাজপ্রাসাদে। সকলের সামনেই ঘোষণা করলেন— '...আমিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, এই পৃথিবী আমার। তোমরা সুখে আছ আমারই অনুগ্রহে। কে বলেছে, —আমার চেয়েও বড় কোন রাজা আছে — আমি সকলকে নিরাময় করেছি ব্যাধি থেকে; আমি রোধ করেছি জরা এবং মৃত্যুকে। একমাত্র তারাই আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে— যারা শয়তান অহ্রিমানে সেবক। আমি চাই— তোমরা আমাকে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা রূপে মেনে নও।'

জমশেদের এই দর্পিত কথায় সবাই নির্বাক। ভয়ে সবাই নতমস্তক। কিন্তু সবাই মনে মনে ভাবলো অতি দর্পের ফলে তার পতন অনিবার্য এবং তা হবে দ্রুতগামী।

হলোও তাই। জমশেদের রাজ্যে হঠাৎই নেমে এলো অন্ধকার। অহুর মাজদো ওকে ত্যাগ করলেন। জমশেদের জীবন বিপর্যয় দেখা দিল।

জমশেদের সেই বিপর্যয়ের কাহিনীও শাহনামাতে বিধৃত। ফেরদৌসী লিখেছেন—জমশেদের অহংকারের শাস্তিদানের জন্য মরুদেশে এক দস্যুপুত্র জোহাক এলো ইরাণে। জোহাককে লোকে বলতো দশসহস্রাশ্ব; দিন রাত তার ঘোড়া পিঠেই কাটতো।

একবার সেই জোহাকের কাছে ইবলিশ (শয়তান) এলো বন্ধুর বেশে। নানা চাটুকতায় ভুলিয়ে ইবলিশ তাকে বশীভূত করলো। জোহাক তার বুদ্ধি ও আত্মাকে সমর্পন করলো ইবলিশের কাছে। ইবলিশ যখন বুঝতে পারলো যে জোহাক তার আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে তখন বন্ধু সুলভ কণ্ঠে জোহাককে বললো— শোন জোহাক তোমাকে এমন গোপন কথা বলবো যা অন্য কেউই জানে না। আর আগে প্রতিজ্ঞা কর; সে গোপন কথা তুমি কাউকে বলবে না আর আমার নির্দেশ অনুসারে কাজ করবে।

জোহাক বললো—প্রতিজ্ঞা করছি।

ইবলিশ বললো— তুমি হবে পৃথিবীর অধীশ্বর। এ মরুভূমি তোমার উপযুক্ত নয়। তারপর জোহাকের কানে কানে যা বললে, তাতে স্তম্ভিত হলো জোহাক। ইবলিশ বললো, তোমার পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার কর।

জোহাক বললো, অসম্ভব–এ কাজ আমি করতে পারবো না।

ইবলিশ কখনো–তুমি আমার নির্দেশ পালন করার প্রতিজ্ঞা করেছো। প্রতিজ্ঞা পালন না করলে তোমার মাথায় নেমে আসবে দুর্ভাগ্যের অন্ধকার। আর আমার কথা শুনলে তোমার মাথায় ছুঁয়ে যাবে সূর্যকে। জোহাক নিরুপায় হয়ে পিতৃঘাতী হলো। সিংহাসনে বসলো নিজে। এরপর ইবলিশ খুশী মনে চলে গেল।

তারপর হঠাৎই একদিন এক তরুণের ছদ্মবেশে এসে জোহাককে বললো হে মহান সম্রাট, আমি রন্ধনকার্যে সুদক্ষ, আমাকে রন্ধনশালার দায়িত্ব তুলে দেবার জন্য। তাই হলো। নতুন পাচক হলো রন্ধনশালার নতুন অধ্যক্ষ।

ফোরদৌসী লিখেছেন, সে সময় খাবারের বৈচিত্র ছিল না। খাদ্যের জন্য কেউ পশুহত্যা করতো না; শাক্ সব্জি দিয়ে আহার্য তৈরী হতো।

ইবলিশ, জোহাককে প্ররোচিত করলো পশুহত্যা করে তার মাংস খাওয়ার জন্য। বললো, —পশুর রক্ত খাও— সিংহের মতো বলশালী হবে।

জোহাক সেই প্রথম রক্তমাংসের স্বাদ গ্রহণ করলো। ইবসিলের রান্নাকরা মোরগ - ময়ূর, ষাঁড় আর ভেড়ার মাংস খেয়ে পরিতৃপ্ত হলো জোহাক। তার সঙ্গে ইবলিশ নিয়ে এলো — তীব্র উত্তেজক সুরা। মদ্যপান করে উত্তেজনায় উল্লাস প্রকাশ করে জোহাক বললো— পাচক তোমার তুলনা হয় না। যা চাও, তাই পাবে তুমি। স্বর্গের পানীয় দিয়ে তুমি আমাকে তৃপ্ত করেছে।

ইবালিশ বললো, হে মহান রাজা, আমি আপনার অনুগতভৃত্য, আপনার অনুগ্রহ হোলেই আমি ধন্য হবো। আমি আর কিছু চাইনা, আপনার দুই কাঁধ চুম্বন করার অনুমতি চাই, — আর কিছু না।

জোহাক সানন্দে সম্মতি দিল। ওর দুই কাঁধে চুম্বন করে ইবলিশ অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর এক আকস্মিক ঘটনা ঘটলো। জোহাকের দুই কাঁধ থেকে উদ্ভূত হলো ভয়ানক দুটি কৃষ্ণবর্ণের সাপ। ভয় পেয়ে জোহাক সঙ্গে সঙ্গে তাদের কেটে ফেললো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুন একজোড়া সাপের উদ্ভব ঘটলো ঐ স্থান থেকে— যেমন ভাবে কাটা গাছের শাখা থেকে উদ্ভূত হয় নতুন শাখা। কোন চিকিৎসকই এই ব্যাধি নিরাময় করতে পারলো না। জোহাক ভীত হয়ে পড়লো।

আবার আবির্ভাব ঘটলো ইবলিশের। বললো— জোহাক, এই হচ্ছে - তোমার ভাগ্য। নাগ দুটিকে হত্যা করার চেষ্টা করো না, ওদের পালন করো। প্রতিদিন ওদের খেতে দাও মানুষের মাথার ঘিলু— তাহলেই ওরা ঘুমিয়ে পড়বে। এ ভাবেই এক সময় ওদের মৃত্যু ঘটবে।

এরপর ইবলিশ চক্রান্ত করলো পৃথিবী থেকে মনুষ্যজাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য।

।। তিন।।

ওদিকে জমশিদের আচরণের জন্য প্রজাদের মধ্যে শুরু হলো বিক্ষোভ। সুরু হলো রক্তক্ষয়ী সংঘাত। অনেকে দেশত্যাগ করে পালাতে লাগলো, অনেকে আশ্রয়, নিল, সর্পভূষণ জোহাকের মরুরাজ্যে। ওরা জোহাককেই ইরাণের সম্প্রাট বলে অভিবাদন করলো। এই সুযোগে সৈন্যবাহিনী নিয়ে জাহাক ইরান আক্রমন করলো। পরাজিত জমশিদ সোনার সিংহাসন সোনার মুকুট ফেলে দেশ ত্যাগ করে অজ্ঞাত বাসে চলে গেল। একশো বছর অজ্ঞাতবাসের পর জমশেদকে দেখা গেল চীন সমুদ্রের তীরে। জোহাকের সৈন্যরা সেখান থেকে জমশেদকে ধরে নিয়ে এলো। জমশেদকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হলো। আদি সভ্যতার প্রবর্তক, বন্যাত্রাণকারী স্বর্ণযুগের সৃষ্টিকার ইরানীর জাতির মহানায়ক অমিত বীর্যবান জমশেদ এইভাবে দর্পের আগুনে পুড়ে মরলেন।

বৈদিক এবং ভারতীয় পুরাণের সম এবং জমশেদকে একই ব্যক্তি বলে মনে করা হয়। আবেস্থায় জমশেদের অপর নাম যিম বা যিমক্শ্বেত যিমের ভগ্নীর নাম যমী। বৈদিক যমের ভগ্নীর নামও যমী। বৈদিক যমের পিতার নাম বিবস্বান (= সূর্য); মাতা সরন্যু গর্ভে যম ও যমীর জন্ম। যম সন্তান বলেই যম ও যমীর নামকরণ। যিমের পিতার নাম বিবনঘন্ত (= বিবনহস্ত) যার অর্থও বিবস্বান।

ভারতীয় পুরাণের মতে—যমই প্রথম জীবিত মানুষ, যিনি সর্বপ্রথম পূণ্যলোকে গমন করেন এবং মৃত জগতের অধিপতি হয়ে দেবত্ব লাভ করেন। বেদে যমের ভয়ংকর দুটি পুরুষের কথা বলা হয়েছে— যাদের নাম শ্যাম ও সবল— এদের চোখ দুটি করে নয়, চারটি করে। এই দুটি পুরুষের প্রহরা অতিক্রম করেই যমলোকে যেতে হয়। ইরানীয় পুরাণেরও বলা হয়েছে— স্বর্গের পথ রক্ষা করে, ভয়ংকর দুটি কুকুর।

যমের ভ্রাতা বিবস্বৎ মনু, প্রলয়ংকর বন্যা থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করেছিলেন মনুই মনুষ্য জাতির আদি পিতা এবং মানব সভ্যতার প্রবর্তক। ইরাণীয় মহানায়ক জমশেদ বা যিমের মনু নামে কোন ভ্রাতার কথা উল্লেখ করা হয়নি। মনুর যাবতীয় কর্ম জমশেদের উপরই আরোপিত। কিংবদন্তীতে বলা হয় যিম ইরানীয় জাতিকে এক ভয়ংকর বন্যা থেকে রক্ষা করেছিলেন।

বস্তুত বৈদিক যম ও ইরানীয় কিংবদন্তীর মহানায়ক যিম বা জমশেদ কাহিনীর মধ্যে দুটি নামের সাদৃশ্য এর তাদের পিতৃনামের সাদৃশ্য আকস্মিক নাও হতে পারে। কোন এক বিস্মৃত অতীতে ভারতীয় ও ইরানীয় আর্যগোষ্ঠীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান ছিল তা অনুমান করা অসংগত মনে হয় না। বৈদিক যম ও ইরানীয় যিমকে প্রাচীন আর্য সমাজের কোন মহানায়কই বোঝায়। বৈদিক যম ও ইরানীয় যিমের মধ্যে কখন কিভাবে পার্থক্য ঘটে যায়। যমকে বলা হয় মৃত্যুপুরীর অধিপতি, আর যিম বাজমশেদকে বলা হয় মৃত্যুঞ্জয়ী— যিনি মৃত্যুকে জয় করেছিলেন। যম দেবত্বে উন্নীত হন অন্যদিকে যিম দেবত্ব শাসন করে নিজের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনেন। বস্তুত, জমশেদের মতো যম ও ছিলেন কিংবদন্তীর নায়ক; জমশেদ তাঁর রাজ্যকে রামরাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করে ধার্মিকদের রক্ষা করেছিলেন, অন্যদিকে যমের স্বর্গরাজ্যে ধার্মিকদের ছিল অবাধ প্রবেশাধিকার। যমের রাজত্বে শীত নেই গ্রীষ্ম নেই দুঃখ নেই—জমশেদের রাজ্যেও তাই। যম মানুষকে পথ দেখিয়ে তাদের শেষ আবাস ভূমিতে নিয়ে আসেন, জমশেদও মানুষ সমাজকে সভ্যতার পথ দেখান। বৈদিক যুগে পরে যম, বিচার ধর্মরাজ রূপে গণ্য হন। অধিকাংশ পন্ডিত যমকে মানুষ মনে করেছেন; তিনি মর্তের প্রথম অধিপতি পরে - মৃতদের রাজা।

প্রকৃতপক্ষে নানা সাদৃশ্যের বিচারে যম ও জমশেদকে পবিত্র আত্মা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ''যিমহে বিবণ গহনে : অশনো ফ্রাগসিন্ যরূমইধে'' —(We adore the holy spirit of jamshed son of fivan gahan) বলাবাহুল্য ফেরদোসীর শাহনামাতে বেদ আবেস্তা এবং শাহনামার ত্রিবেণী সংগম।

অনেকের অনুমান— ইরাণীয় আর্যদের সঙ্গে বিরোধ ঘটার ফলে যিম দেবকুলে নিম্নবর্গীয় দেবতা রূপে পরিগণিত হন। তাই বেদে যম মাত্র চারটি সূক্তে উল্লেখিত। পর্জন্যের মতো যমও পঞ্চমশ্রেণীর দেবতা। বেদে কতবার নাম উল্লেখিত সেই সূত্রধরেই এই শ্রেণী বিভাগ। যম লঘু - দেবতা হলেও প্রাথমিকভাবে তাঁর যে গুরুত্ব ছিল, তা কয়েকটি সূক্ত থেকেই বোঝা যায়। যম–সংযুক্ত অগ্নিকে প্রকাশক করেন, তাই লঘু - দেবতা হলেও বেদ যমও দেবতা রূপে গৃহীত। যমকে পুরোপুরি মানুষ বলে মনে না করলেও যম যে মরণশীল– একথা বেদেই বলা হয়েছে।

জমশেদের মতো যম ও এক গণনায়ক– যিনি মনুষ্য সমাজের লোকের মৃত্যুর পরে যমলোকে নিয়ে যাবার পথ প্রদর্শক।

যম ও যমীকে আবেস্তায় বলা হয়েছে মানব সমাজের আদি পিতা ও আদি মাতা। এই উপন্যাসের পরবর্তী অংশে বৈদিক যম ও যমীর সঙ্গমকে অস্বীকার করা হয়েছে। যমের পরিবর্তে মনুকে আদি পিতা বলা হয়েছে।

আদিতে যম দয়ালু। কিন্তু পৌরাণিক যম ভয়ংকর। বৈদিক যম অবশ্যই এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। যমের জন্ম হয় সকলের আগে, তিনিই প্রথম যাঁর মৃত্যু হয়– আবার তিনিই প্রথম যিনি ইহলোকব্যাপী আত্মাদের অধিপতি।